কঙ্গোর জঙ্গলে

কঙ্গোর জঙ্গলে

(অভিনব শিকার কাহিনী)

অতনু দত্ত

জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, (১১৫এ, আপার চিৎপুর রোড), কলিঃ-৭০০০০৬

॥ এক ॥

সুন্দরবনের অনেক গল্প তোমরা শুনেছ। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার তো জগদ্বিখ্যাত। অতএব সুন্দরবনের নতুন গল্প শুনিয়ে তোমাদের বিরক্ত করার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।

আজ আমি বলব—কংগোর জঙ্গলের শিকারের গল্প। এত বড়ো গভীর জঙ্গল পৃথিবীর আর কোথায়ও নেই। এ জঙ্গলের কোথাও কোথাও এমনকি সূর্যের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করে না। নর-খাদক নিগ্রোরা, আর বেটে-খাটো পিগমীরা এ অঞ্চলে বাস করে। এ জঙ্গলের মত ভয়াবহ জঙ্গল, পৃথিবীর আর কোথায়ও নেই। আমেরিকার আমাজনের জঙ্গল, আর আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলও কংগোর এই গভীর জঙ্গলের কাছে অতি তুচ্ছ।

এখানে বুনো মানুষ ছাড়া অন্য কোন মানুষের পক্ষে বাস করা অসম্ভব। সভ্যতার আলোক এখনও এ অঞ্চলে প্রবেশ করেনি। এরা এখনও সেই আদিম যুগের কাছাকাছি রয়ে গেছে। কংগোর জঙ্গলে সকল রকম জন্তুই আছে। বাঘ, সিংহ, গরিলা, হাতী, জলহস্তী, কুমীর। সব কিছুই এখানে আছে। এখানে বাঁচার জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করতে হয়।

এই ভয়ঙ্কর কংগোর জঙ্গলেও আমাকে যেতে হ'লো। আমার এক বন্ধু, নাম তাঁর অলক রায়। এক বিদেশী হাতীর দাঁত-সংগ্রহকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, কংগোয় গিয়েছিল। কিন্তু তারপর তিন-চার বছর পেরিয়ে গেছে, অথচ তার আর কোন খোঁজ-খবরই নেই। অলক রায় চিরদিনই একটু এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছিল—তাই সুদূর কংগোর জঙ্গলেও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যেতে এতটুকুও দ্বিধা করে নি। কিন্তু ওর যাওয়ার খবর আছে, অথচ ফেরার খবর নেই।

একদিন ওর স্ত্রী এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমায় অনুরোধ করলেন কংগোয় গিয়ে তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে আসতে। তিনি যে কোন মোটা অংকের অর্থব্যয় করতে রাজী। অলক রায়ের টাকাকড়ির কোন অভাব ছিল না।

আমি বললুমঃ মিসেস রায়, কংগোর জঙ্গল খুব ছোট নয়, তা ছাড়া ও-রকম ভয়াবহ ও শ্বাপদসঙ্কুল অঞ্চল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ওখানে তো শুধু একা যাওয়া যাবে না—দল পাকিয়ে যেতে হবে।

মিসেস রায় অকপটে বললেন, আপনার দলে যত সংখ্যক ইচ্ছা লোক নিন। তার ফলে যদি বেশী টাকাও লাগে আমার কোন আপত্তি নেই! আমার স্বামীকে খুঁজে বের করতে হবেই, অবশ্য যদি তিনি বেঁচে থাকেন। যদি মারা গিয়েও থাকেন, তার মৃত্যুর পেছনে কোন রহস্য নিশ্চয়ই আছে। কারণ আমি বিশ্বাস করি আমার স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হ'তে পারে না।

আমি মিসেস রায়কে বললুম ঃ দেখুন আজই আপনাকে ঠিক কথা দিতে পারছি না। কারণ অন্যান্য শিকারী বা সাহসী বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে একবার আলাপ করে দেখি—তারা কে কে যেতে রাজী হ'ন—আমি একা নিশ্চয়ই ওই কংগোর ভয়াবহ জঙ্গলে যাবো না।

বিদায় নিয়ে যাবার সময় মিসেস রায় মিনতির সুরে বললেন, আপনার কাছে অনেক ভরসা নিয়ে এসেছিলুম—এ কাজের ভার একমাত্র আপনিই নিতে পারেন। যত টাকাই লাগুক—আমার কোন আপত্তি নেই।

আমি ববলুম ঃ তবু আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে—তার আগে আপনাকে ফাইন্যাল কথা দিতে পারছি না। আপনার টেলিফোন নাম্বারটা আমার কাছে তো রয়েছে, আমি আপনাকে বিকেলে টেলিফোন করে মতামত জানাব।

মিসেস রায় চলে গেলেন।

কংগোর জঙ্গলের ওপর আমার প্রবল আকর্ষণ আছে। কংগোর জঙ্গল ছোটবেলা থেকেই আমাকে হাতছানি দিয়ে বার বার ডেকেছে। আমার অর্থ ও সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারিনি। কারণ আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সুন্দরবন অঞ্চলে বন্দুক নিয়ে ছুটে যেতে পারলেও একক প্রচেষ্টায় কংগোর জঙ্গলে শিকার করতে যাওয়ার মতো সামর্থ্য আমার নেই। ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় হয়তো শিকারের সন্ধানে ছুটে যেতে পারি ; কিন্তু ভারতের বাইরে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। সামর্থ্যের অর্থ— অর্থসঙ্গতি নেই।

অতএব মিসেস রায় যে সুযোগ আমার কাছে তুলে ধরেছেন—শিকারী জীবনে অতো বড় সুযোগ হয়তো আমার কাছে কোনদিনই আসবে না। বাঘ তো অনেক শিকার করলুম। এবার না হয় একবার গরিলার সঙ্গেই পাল্লা দেওয়া যাবে। হয়ত কংগোর জঙ্গল থেকে জীবন নিয়ে নাও ফিরতে পারি! নাই বা ফিরলুম, ক্ষতি কি? মৃত্যু তো একদিন স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের কাছে আসবেই!

তখন তাকে বাধা নিশ্চয়ই দিতে পারব না।

মরতে আমি অরাজী নই। যদি মরার মতো মরতে পারি, বীরের মতো মরতে পারি—সে মৃত্যু আমার কাম্য।

অতএব মিসেস রায়ের প্রস্তাবে আমি এক রকম রাজী হয়ে গেলুম। এখন অন্যান্যদের অন্ততঃ কয়েকজনকে রাজী করাতে পারলেই হোল।

প্রথমে দেখা করলুম—শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে। কিন্তু কংগোর জঙ্গলে শ্রীপতিবাবু যেতে রাজী হলেন না। যেখানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি একেবারে নিশ্চিত—সেখানে প্রাণহানি করতে তিনি যেতে রাজী নন্।

তারপর পটলবাবুর বাড়ীতে গেলুম। পটলবাবুকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করালুম। পটলবাবু যদিও সাংঘাতিক ভীতু প্রকৃতির—তবু পটলবাবু লোভী। সেই লোভের ফাটল ধরেই পটলবাবুকে পটালুম। বেলুনকে ফুলিয়ে ফাটানোর মতো। বললুম, যা ইচ্ছে খেতে পারবেন। টাকাকড়িও পাবেন। শেষে পটলবাবুও যেতে রাজী হলেন। আমি অবশ্য জানি, ওরকম

জায়গায় পটলবাবুর মতো ভীতু শিকারীকে নিয়ে গিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়তে হবে। তবে পটলবাবুর কিন্তু আর একটা গুণ আছে—পটলবাবু রসিক ব্যক্তি। পটলবাবুকে এক কথায় রসগোল্লার মত রসালো ব্যক্তিও বলা চলতে পারে।

তারপর এলুম টালায় টেনিদার কাছে। টেনিদাও বয়েস-কালে একজন জবরদস্ত শিকারী ছিলেন। অনেক বাঘ মেরেছেন। বাঘের মুখগুলো সব দেওয়ালে লটকে রেখেছেন। অনেক কষ্টে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে—টেনিদাকেও বাগিয়ে ফেললুম।

তারপর এলুম বালীতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়ী। যজ্ঞেশ্বরবাবু গোঁফে তা দিয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। কংগোর জঙ্গলের কথা বলতেই আঁৎকে উঠলেন : সে কী মশায়। সারা ভারতবর্ষে আর শিকারের জায়গা পেলে না। শেষে সেই কংগোর জঙ্গলে।

আমি যাওয়ার ব্যাপারে কার্য-কারণ ও উদ্দেশ্য সবই যজ্ঞেশ্বর বাবুকে বুঝিয়ে বললুম। শেষ পর্যন্ত যজ্ঞেশ্বরবাবুও রাজী হয়ে গেলেন।

সকাল দশটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পটলবাবু, টেনিদা ও যজ্ঞেশ্বরবাবু ছাড়াও আরো আটজন নব্য শিকারীকে পাকড়াও করে ফেললুম।

সবশুদ্ধু আমরা শিকারী দাঁড়ালুম—এক ডজন। আর আমার চাকর নেপালের গোপাল ও আর একজন ছোটনাগ-পুরের আদিবাসী চাকর পটকাকে নিয়ে আমরা হলুম—প্রায় দলে চৌদ্দ জন।

তারপর আবার আফ্রিকায় পৌঁছে কংগো অঞ্চলের কিছু লোককে ভাড়া করে সঙ্গে রাখতে হবে। অতএব দলটা একেবারে ছোটখাটো হবে না।

বিকেল পাঁচটার সময় মিসেস রায়কে ফোন করে জানালুম : যে আমরা সব তৈরী—এবার আপনি ব্যবস্থা করুন। তবে বেশী দেরী করবেন না—কারণ শুভস্য শীঘ্রম্। বেশী দেরী হ'লেই আবার অনেকে ভয়ের চোটে সরে পড়তে পারেন। অতএব—

মিসেস রায় উত্তরে বললেন : আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই পাশপোর্ট, প্যাসেজ সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলছি।

অতএব জুলাই মাসের পনের তারিখে আমরা বোম্বে মেলে উঠে বসলুম। আমরা চৌদ্দজন, চৌদ্দটা বন্দুক। চৌদ্দটা পিস্তল। বলা বাহুল্য, আমার চাকর নেপালের গোপাল আর ছোটনাগপুরের পটকা ইতিমধ্যেই বন্দুক আর পিস্তল চালানোতে বেশ রপ্ত হয়ে পড়েছে।

আমাদের প্রথমে বোম্বে যেতে হবে। ওখান থেকে, জাহাজে করে দার-এস-সালাম বন্দরে। তারপর দার-এস-সালাম থেকে লিওপোল্ড্‌ভিলে, এবং তারপরেই কংগোর গভীর জঙ্গলে। মিসেস রায় আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই মিঃ অলক রায়ের এক কপি করে পাশপোর্ট সাইজের ফটো দিয়ে দিলেন।

আমরা ১০ই তারিখ সকালে এসে বোম্বের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে পৌঁছলুম। জাহাজ ছাড়তে আরও দু'দিন বাকী—অতএব বোম্বের সবচেয়ে নামকরা হোটেল তাজে সদলবলে গিয়ে উঠলুম। সমুদ্রের ধারে, ঠিক ইণ্ডিয়া গেটের

কাছেই হোটেলটা। সত্যি অদ্ভুত সুন্দর। সামনে তরঙ্গায়িত আরব সাগর।

বিশে জুলাই আমাদের জাহাজ বোম্বে বন্দর থেকে ছাড়বে। কোলকাতা থেকে প্লেনে করে মিসেস রায়ও এলেন জাহাজ-ঘাটায়।—আমাদের দ্বিতীয় বারের মতো বিদায় জানালেন।

জাহাজ চলতে লাগল। সাতদিন, সাতরাত্রি ধরে চলছে। এ চলার যেন বিরাম নেই। বিরতি নেই কোথাও। অকূল সমুদ্র হয়ত বা কূল হারিয়ে ফেলেছে। এ যেন রূপকথার গল্পের মতো সাত সমুদ্র পেরিয়ে আমাদের রাজপুত্রকে খুঁজে আনবার জন্য আমাদের এই চলা।

যুগটা পাল্‌টেছে, কিন্তু রূপকথা পাল্‌টায়নি। আধুনিককালের রাজপুত্র অলকবাবুর মতো ধনীর আলালের ঘরের দুলালের রূপকথার গল্প আজ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষীরাজের জায়গা নিয়েছে প্লেন। অতএব যুগটা পাল্‌টে গেলেও রূপকথার গল্প পাল্‌টায়নি। নূতন রূপ নিয়েছে মাত্র।

দশ দিন ধরে অনবরত চলার পর, এগার দিনের দিন আমরা দার-এস্‌-সালাম এসে পৌঁছলুম।

ওখান থেকে আবার দলবল নিয়ে বেলজিয়ান কংগোর রাজধানী লিওপোল্‌ড্‌ভিলে রওনা দিলুম।

পটলবাবু একবার বললেন: যা জঙ্গল, চলুন, প্রাণ হাতে করে দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাই।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম: তা আর হয় না, তাহ'লে মিসেস রায়ের সঙ্গে বেইমানী করতে হয়।

অতএব চলতে হবে—যজ্ঞেশ্বরবাবুও আমায় সমর্থন করে বল্‌লেন।

দার-এস্‌-সালাম থেকে টাঙ্গানিকা রাজ্যের ওপর দিয়ে, বেলজিয়ান কংগোর রাজধানী লিওপোল্‌ড্‌ভিলে আসতে—আমাদের প্রায় পাঁচদিন সময় লাগল।

রাস্তা তো আর কোলকাতার মতো নয়, উঁচু-নীচু ও দুর্গম পথ। সে পথে দুর্গতি অনেক। যজ্ঞেশ্বরবাবু চলতে চলতে হেঁড়ে গলায় গান গাইলেন ঃ দুর্গতি সব দুর্গ হয়ে আনবে জয়ের উন্নতি···

লিওপোল্‌ড্‌ভিলে এসে আমরা দুদিন বিশ্রাম নিলুম! কারণ এই দু'দিন বিশ্রামের পরই আমাদের কংগোর জঙ্গলে ঢুকতে হবে। চলতে হবে—উদ্দেশ্যহীনভাবে। কবে ফিরব তার কিছু ঠিক নেই। আদৌ ফিরব কিনা তাও নিশ্চিত নয়। কয়েকটি তাঁবু, খাদ্য-দ্রব্য এবং প্রায় ত্রিশজন স্থানীয় কুলী মজুর ও শিকারী সংগ্রহ করে নিলুম। অর্থের আমাদের অভাব নেই।

যজ্ঞেশ্বরবাবু কোলকাতা থেকে আসার সময় পকেট পঞ্জিকা নিয়ে এসেছিলেন। অতএব একটা সুদিন দেখে—সকালবেলা আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

কংগোর জঙ্গলই বটে! এ জঙ্গলের কোথাও কোথাও সূর্যের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করে না। দিনের বেলাতেও টর্চ জ্বেলে পথ চলতে হয়।

দলের সবার আগে দুজন স্থানীয় লোক, তারপর আমি আমার পরে অন্যান্য সকলে।

দু'চারটে চিতাবাঘ আমাদের এপাশ-ওপাশ দিয়ে চলে গেল। আমরাও ওদের বিরক্ত করিনি, ওরাও আমাদের বিরক্ত করে নি। কংগোর জঙ্গলে এতো পশু-পাখী যে, যা দেখব তাই গুলি করে মারতে গেলে—আমাদের একটা কার্তুজও অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব যতটা পারি—এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এখানেই তো পথ শেষ নয়—পথে গরিলা আছে, সিংহ আছে।

তবু একটা চিতাবাঘকে গুলি না করে পারা গেল না। আমাদের দলের শেষ কুলীটার গায়ে চিতাটা গাছ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এত লোক, ব্যাটার সাহস তবু কম নয়।

চিতাবাঘটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লুম, দুড়ুম-দুম্।

লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে চিতাবাঘটা একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল। অবশ্য লোকটাও খুব জখম হো'ল। সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক শুশ্রূষার জিনিস-পত্র ছিলই, তাছাড়া আমাদের যজ্ঞেশ্বরবাবু একজন পাশ করা ডাক্তার। অতএব কিছুই অসুবিধে হো'ল না। লোকটার মালপত্র অন্য একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা আবার রওনা হলুম। কংগোর লোকতো এক একজন এক একটা টার্জেন। অতো আঘাতের পরও লোকটা অন্য একটা কুলীর থেকে সামান্য কিছু মালপত্র চেয়ে নিয়ে চলতে লাগল।

আমাদের রাস্তার সামনে পড়ল ছোট্ট একটা পাহাড়ী-নদী। নদী ঠিক নয়, চওড়া একটা নালার মতো। ওটা পেরিয়ে যেতে হবে। জল অবশ্য বেশী হবে না—এক হাঁটু জল। কিন্তু জলে কুমীর আছে। ওপাশে নদীর মুখটা চওড়া, আর একটু দূরে তাকিয়ে দেখলুম—প্রায় একশ' কুমীর চড়ার ওপর ঘুমুচ্ছে।

প্রথমে আমার সামনের দুটো লোক পেরিয়ে গেল, তারপর আমি, যজ্ঞেশ্বরবাবু ও অন্যান্যরা। দূর থেকে কুমীরগুলো হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এবার পটলবাবুর পেরোবার পালা। পটলবাবু মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়ালেন। 'কুমীর' কথাটা বলেই পটলবাবু কেঁদে ফেললেন। আমি এগিয়ে দেখলুম—একটা মাঝারি সাইজের কুমীর হাঁ করে পটলবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। আমার বন্দুক গর্জে উঠল। দুড়ুম—দুড়ুম—দুম। পাখীদের ঝটপটানি সুরু হো'ল, গাছের ডালে ডালে বাঁদর আর শিম্পাজীদের চলাফেরা।

পটলবাবু এ তীরে এসে পৌঁছে বললেন, আর একটু হ'লেই—কুমীরটা আমার পা দুটো কাটোয়ার ডাঁটার মতো চিবিয়ে ফেলত।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন: হঠাৎ জঙ্গলে এসে কাটোয়ার ডাঁটার কথা মনে করিয়ে দিলেন তো। এখন আমার দাঁতটা কাটোয়ার ডাঁটা চিবোনর জন্য সুড়্ সুড়্ করছে।

টেনিদা বললেন: কোথায় কাটোয়া আর কোথায় কংগোর জঙ্গল।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। কংগোর জঙ্গলে সব সময়েই রাত্রি। সূর্যের আলো কখনও কোন বিশেষ অংশে পড়ে।

কাছেই একটা পিগমীদের গ্রাম। আমাদের দল দেখে পিগমীরা সার বেঁধে তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের তীরের ফলাগুলো তীব্র বিষে মাখা।

আমার সামনের দু'টো লোক এগিয়ে গিয়ে ওদের—

সর্দারের সংগে অনেকক্ষণ ফিসফিসিয়ে কথা বলল, তারপর ওরা দেখলুম, খিল খিল করে হেসে উঠল। ছোট ছোট বেঁটে-খাটো লোকগুলো কুৎকুতে চোখে তাকিয়ে রইল। আমরা গ্রামের মধ্যে গিয়ে তাবু ফেললুম—একটা চালা ঘরে গিয়ে দেখলুম—পিগমীরা বাঁশের কাপে করে মদ খাচ্ছে। পটলবাবু আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি মন্তব্য করলেন: এখানেও ঢুকু ঢুকু চলে।

শুধু মদ নয়, সামনে একটা বিরাট সাপ সেদ্ধ করা খোলস ছাড়ানো। এক এক চুমুক মদ খাচ্ছে—আর সাপের মাংস খাবলা খাবলা করে গিলছে। একঘরে প্রায় বিশজন হবে। সমবায় পদ্ধতিতে ওদের খাওয়া দাওয়া।

হঠাৎ পিগমীদের বড়ো সর্দারের নজর পড়ল আমাদের পটলবাবুর দিকে। নিজেরা কানে কানে অনেকক্ষণ ফিসফিসিয়ে কি বলল, তারপর চার পাঁচজন উঠে এসে পটলবাবুকে ধরে একদম আসরে নিয়ে গিয়ে বসাল। পটলবাবু সেদ্ধ আর পচা সাপের গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রইল।

সর্দার পটলবাবুর দিকে একটা বাঁশের পেয়ালায় মদও দিল। পটলবাবু কিছুতেই খাবে না। আমাদের সঙ্গে যে শিক্ষিত নীগ্র ছেলেটি ছিল, বলল: ওরা যা দেবে পটলবাবুকে, তা খেতেই হবে। পটলবাবুকে ওরা বন্ধু বানাতে চায় বন্ধুর জন্যে ওরা জীবন দিতে পারে। কিন্তু পটলবাবু যদি ওদের দেওয়া খাবার না খায়—তবে ওদের বন্ধুত্বের অপমান

করা হবে। তখন ওরা আমাদের সকলের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। ওরা শত্রু হয়ে দাঁড়ালে ফল খুব ভাল হবে না।

অতএব পটলবাবুকে এক ঢোক খেতেই হো'ল। পটলবাবু আমায় বলল, যা বিশ্রী গন্ধ। আমার পেট সাংঘাতিক গুলোচ্ছে। শুধু মদের এক ঢুকুতে শেষ নয়, পচা সাপের এক খাবলা পিগমী-সর্দার পটলবাবুর সামনে তুলে ধরল। পটলবাবু কিছুতেই খাবে না, পিগমীরা না খাইয়ে বন্ধুকে কিছুতেই ছাড়বেনা। ওরা শেষে কিছুটা পটলবাবুর মুখেই পুরে দিল। পটলবাবু ওয়াক থু করে দুবার বমি করলেন। তারপর চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

সেই আফ্রিকান ছেলেটি পিগমী সর্দারের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল ঃ লোকটার ফিটের ব্যামো আছে—মাঝে মাঝে এরকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তোমাদের খাদ্যের ওপর মোটেই ওর ঘৃণা নেই।

অতএব জল আর পিগমীদের মদের ছিটে দিয়ে পটলবাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হো'ল।

ততক্ষণে পিগমীরা সমবায় প্রথায় খেয়ে খেয়ে সাপের মাংস শেষ করে ফেলেছে।

তারপর দু'টো পিগমী বাঁশে ঝুলিয়ে একটা বাচ্চা গরিলাকে আগুনে ঝলসে নিয়ে এলো। আজ সারাদিনে ওরা সমবায় প্রথায় শিকার করে—একটা পাইথন ও একটা বাচ্চা গরিলা ধরেছে। অতএব এই ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা।

গরিলার চামড়াটা পিগমীরা ছাড়িয়ে নিলো। অর্দ্ধেকটা

গরিলা কেটে ওদের মেয়েদের ও বাচ্চাদের আসরে পাঠিয়ে দিলো।

আর বাদ-বাকীটা নিজেরা জন্মদিনের কেকের মতো কেটে কেটে খেতে লাগলো। পটলবাবুর জ্ঞান ফিরে এলেও আবার আগুনে ঝলসানো গরিলার বাচ্চা দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সর্দার তবু অজ্ঞান পটলবাবুর মুখে গরিলার মাংস পুরে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারলো না।

যা হো'ক ওদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমরা পটলবাবুকে আমাদের তাঁবুতে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিলুম। যজ্ঞেশ্বরবাবু পটলবাবুর নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

টেনিদা যজ্ঞেশ্বরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন: পটলবাবু আবার পটল তুলবেন নাতো ? যা খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপার ওর উপর দিয়ে গেছে।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন: না, পটলবাবুর পটল তোলার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমরা আশ্বস্ত হলুম। ভাল করে পটলবাবুর হাত, মুখ, চোখ ধুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হো'ল। যা খাবার ওরা খাইয়েছে—এরপর আর পটলবাবুর কোন কিছু খাওয়ার প্রবৃত্তি হবে না—সে-কথা আমরা সকলে একরকম ধরে নিয়েছিলুম।

আমরা মাখন-রুটি, ডিম-সেদ্ধ ও কলা খেয়ে রাতের মতো ডিনার সেরে নিলুম, কথা রইল অর্ধেক লোক রাত্রিবেলা পাহারায় থাকবে—অর্ধেক ঘুমুবে। আবার ওরা উঠলে, এরা ঘুমুবে।

আফ্রিকান ছেলেটি বলল : এ অঞ্চলে যথেষ্ট গরিলা আছে। আর পিগমীরা খুব ভাল জাল তৈরী করতে পারে—ঐ জাল দিয়েই ওরা গরিলাকে ঘিরে ফেলে। তারপর তীর আর বর্শার খোঁচায় গরিলাকে মেরে ফেলে।

যজ্ঞেশ্বরবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন : গরিলারা যে কাছাকাছি কোথায়ও আছে, সে আমি আজ পিগমীদের গরিলার বাচ্চার মাংস খাওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছি।

আমি একটু শঙ্কিত হয়ে বললুম : প্রথমেই একেবারে গরিলার মুখে পড়লুম দেখছি!

সত্যি একে কংগোর জঙ্গল, তারপর আবার প্রথমেই গরিলার মতো জন্তুর মুখে পড়ব বলে ভাবিনি। আমার মতো সাহসীরও মনে একটু শঙ্কা জাগবে বৈকি! তবু একটু সাহস সঞ্চয় করলুম। পিগমীদের মতো বেঁটে-খাটো লোকেরা যদি গরিলার মতো অমন জন্তুর সংগে পাল্লা দিয়ে পাশাপাশি কাটাতে পারে, আমরা ওদের ডবল হয়েও কেন এতো ভয় পাব? মৃত্যুকে এতো ভয় কেন? মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দেব বলেই তো এখানে এসেছি। তাছাড়া আমরা যেখানে তাঁবু ফেলেছি তার চারপাশেই পিগমীদের ডেরা।

ভগবানের নাম স্মরণ করে ঘুমিয়ে পড়লুম, অর্ধেক রাতে আবার উঠে পাহারার কাজে লাগতে হবে। পটলবাবুর আজকের রাত সম্পূর্ণ বিশ্রাম। যা খাওয়া পিগমীরা খাইয়ে দিয়েছে—তারপর আবার খাওয়া। আমি আর যজ্ঞেশ্বরবাবু ঘুমিয়ে পড়লুম, কুলীদের মধ্যে যাদের ঘুমোবার কথা তারা

ঘুমিয়ে পড়ল। আমার সংগে একটা এলার্ম ঘড়ি। ঘড়িতে রাত দু'টোর এলার্ম দিয়ে রাখলুম।

রাত একটার সময় হঠাৎ পটলবাবুর গলা শুনে আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

জিজ্ঞেস করলুম : কী খবর পটলবাবু, জেগে কথা বলছেন, না স্বপ্নে কথা বলছেন।

পটলবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন : পেটের মধ্যে ছুঁচোয় ডন-বৈঠক দিচ্ছে, ঘুমুব কি করে ? সাংঘাতিক ক্ষিদে লেগেছে।

টেনিদা ঘুমোয়নি, বোধ হয় ভয়ে। পটলবাবুর কথা শুনে টেনিদা বলল : কেন পিগমীদের ওখানে অতো ডিনার খেয়েও আপনার ক্ষিদে মেটেনি, সাপ সেদ্ধ—গরিলার মাংসের ষ্টু।

পটলবাবু বললেন : ওকি খাদ্য, ওতো অখাদ্য। দুপুরে যা খেয়েছিলুম, তাও বমির সংগে বেরিয়ে গেছে।

আমি বললুম : পটলবাবু, অতো ভূমিকার দরকার নেই—ওই কোণে আপনার খাবার আছে, খেয়ে ফেলুন।

টেনিদাকে বললুম : টেনিদা, রাত প্রায় দেড়টা হো'ল আর ঘুমোবার চেষ্টা করবেন না কারণ আমাদের আবার রাত দুটো থেকে পাহারা দিতে হবে। যজ্ঞেশ্বরবাবুকেও ডেকে দিন।

সত্যি ! যজ্ঞেশ্বরবাবু লোক বটে ! কংগোর জঙ্গলেও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। অনেক কষ্টে যজ্ঞেশ্বরবাবুকেও ডেকে তোলা হ'লো। অসময়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাতে রাক্ষসদের অতো বেগ পেতে হয়নি। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ঘুম ভাঙ্গাতে, আমাদের যা কষ্ট পেতে হ'ল। জোর করে সবাই ধরাধরি করে বসিয়ে

দিলুম, বসে বসেই যজ্ঞেশ্বরবাবু নাক ডাকাচ্ছেন। শোয়া বা বসায় ওর ঘুমের কোন ব্যাঘাত নেই। আশ্চর্য্য লোক বটে। সবাই মিলে আমরা যজ্ঞেশ্বরবাবুকে দাঁড় করিয়ে দিলুম, যজ্ঞেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাক ডাকাতে আরম্ভ করলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নানা রকম কসরৎ করে যজ্ঞেশ্বরবাবুর ঘুম ভাঙালুম।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম, অন্যান্য সবাই যারা এতক্ষণ জেগেছিল—তাদের ঘুমুতে বললুম। কুলীরা একপাশে আগুন জ্বেলে জেগে আছে। একে কংগোর জঙ্গল, তায় নিশুতি রাত। ভয়ে গাটা শিউরে উঠল। হায়নার অট্টহাস্য শুনে যজ্ঞেশ্বরবাবুর মতো সাহসী লোকও ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

দূর থেকে সিংহের গর্জনও শুনতে পেলুম। যজ্ঞেশ্বরবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, কাছাকাছি পশুরাজও রয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।

টেনিদা বললেন : এখানে সব আছে, এটা কংগোর জঙ্গল।

ভয়ে গাটা ছম্ ছম্ করতে লাগল। হঠাৎ একটা হিস্ হিস্ শব্দ শুনে আমরা সবাই সচকিত হয়ে উঠলুম। ডান পাশে তাকিয়ে দেখলুম, বিরাট এক অজগর সাপ একটা গাছে জড়িয়ে আছে, মুখটা আমাদের একটা তাঁবুর দিকে। লেলিহান জিহ্বা।

আর দেরী নয়। আমার বন্দুক গর্জে উঠল। দুড়ুম্—দুড়ুম্—দুম্। সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরবাবুও গুলি করলেন। ভদ্রলোক নাক ডাকাতে পারেন, কিন্তু শিকারের পাকা হাত, অব্যর্থ লক্ষ্য। সাপটার মাথা নুয়ে পড়ল।

আমি আবার গুলি করলুম। সাপেরা সহজে মরেনা। অতএব সতর্ক হওয়া ভাল। বন্দুকের শব্দে পাখিরা কিচির মিচির করে উঠল, শিম্পাঞ্জীদের হল্লা গুল্লা স্থরু হো'ল। পিগমীদেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে, ওরাও হৈ চৈ করতে করতে দলবেঁধে ছুটে এলো। এসেই দেখল বিরাট এক সাপ। ওদের আর আনন্দ ধরে না। সকাল না হ'তেই—শিকার। প্রায় দশ জন পিগমী সাপটাকে বয়ে নিয়ে—ওদের ভোজনাগারের দিকে চলে গেলো। আমাদের কল্যাণে ওদের সকালের ব্রেকফাষ্ট বেশ ভালোই হবে।

রাত চারটে হ'বে। হঠাৎ উত্তরের দিকে তাকিয়ে যজ্ঞেশ্বর বাবু বললেন, দূরে একটা কালো ছায়ার মতো কি দেখাচ্ছে? আমিও তাকিয়ে দেখলুম, তবে ঠিক বুঝতে পারলুম না।

কিছুক্ষণ পর দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আর একটা কালো ছায়ার মতো। জিনিসটা যে কি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

টেনিদা বললেন হয়ত কোন গাছ-টাছ হবে। যজ্ঞেশ্বরবাবু উত্তরের দিকে তাকিয়ে বললেন, গাছ নয়। গাছ হ'লে ওরকম নড়ত নাকি? ও তো এদিকেই আসছে।

আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, ওটা কালো ছায়ার মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেন দুদিক থেকে দু'টো কালোপাহাড়—আমাদের চেপে মেরে ফেলতে চায়।

আফ্রিকান ছেলেটিকে ডেকে তুললুম। ছেলেটি দু'দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বলল: ওরা নিশ্চয় গরিলা, পিগমীদের

আক্রমণ করতে আসছে। আজকে যে গরিলার বাচ্চাটাকে খেয়েছে, এরা নিশ্চয়ই ওর বাবা-মা।

আমি বললুম এখন উপায় ?

আফ্রিকান ছেলেটি বলল : পালাবার পথও নেই। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হ'বে। দেখা যাক ওরা কি করে।

দুদিক থেকে দুটো দৈত্য ছুটে এলো, যমদূতের মত। ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের মতোই ফোঁস্ ফোঁস্ একটা চাপা গর্জন শুনতে পেলুম। তাঁবুর ভেতরে যারা ঘুমিয়েছিল—তাদের সবাইকে জাগিয়ে দিলুম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'বে। হয় মৃত্যু, না হয় জীবন।

নিজেদের বুক থাপড়াতে থাপড়াতেই ওরা এগিয়ে এলো—রেগে গেলে ওরা নিজেদের বুক থাপড়ায়।

উত্তরের দিকের গরিলাটা গর্জন করে উঠল, তারপরই পিগমীদের একটা ডেরা ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলল।

আর একটা পিগমীকে ইঁদুর ছানার মতো দুহাতে শূন্যে তুলে—ঘাড় মটকে দূরে ফেলে দিল। ওধারের পিগমীরা সব জেগে গেল। তীর ধনুক আর জাল নিয়ে তৈরী হয়ে সার বেঁধে দাঁড়াল।

আমি ফায়ার করতে যাচ্ছিলুম, আফ্রিকান ছেলেটি আমায় বাধা দিয়ে বলল : আগে পিগমীদের সঙ্গে একচোট হয়ে যাক, আমরা এখনও গরিলাদের শত্রু নই। যতক্ষণ নীরব দর্শকের মতো দেখা যায়, দেখুন। আর তাঁবু গোটাবার হুকুম দিয়ে দিন, একটু রাস্তা পেলেই এখান থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে

যেতে হবে। যা ব্যাপার দেখছি—গরিলারা ছেড়ে কথা কইবে না।

দক্ষিণের দিক থেকে যে গরিলাটা আসছিল, সেটার গর্জন আরও সাংঘাতিক। সমুদ্রের গর্জনের মতো গুরু গম্ভীর। ওটাই বোধ হয় বাচ্চাটার মা, আমি অনুমান করে নিলুম।

আমি লোকদের তাঁবু গুটিয়ে ফেলবার হুকুম দিলুম। কুলীদেরও মালপত্র কাঁধে নিয়ে দাঁড়াতে বললুম। ব্যাপার বেগতিক দেখলে—দলবল নিয়ে পালাতে হবে।

পিগমীরা উত্তরের গরিলাটাকে তীর ছুঁড়ে মেরেছে—গরিলাটা আরো ক্ষেপে গেছে। যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই শেষ করছে। সে সময় গরিলার মুখের দিকে আমিও তাকিয়ে থাকতে পারলুম না—কি ভয়ঙ্কর মুখ। তীর ওর দুপাশের গালে লেগেছে। দু'পাশ থেকে রক্ত ক্ষরণ হ'চ্ছে। সে এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। পিগমীরা জাল নিয়ে চার ধার থেকে উত্তরের গরিলাটাকে আটকে ধরেছে! ছোট বেঁটে-খাটো হ'লে হবে কি—পিগমীদের বুদ্ধি অদ্ভুত। কাপড়ের বালাই নেই, ল্যাংটোই পড়ে থাকে। তবুও বুদ্ধির দৌড়ে—অতো বড় গরিলাটাকেও কাবু করে ফেলেছে। ওদের দড়ি ঠিক সূতো বা পাটের নয়। একরকম মাছের আঁস থেকে পাকিয়ে ওরা দড়ি তৈরী করে জাল বানায়। সে জাল যেমন শক্ত, তেমন মজবুত। গরিলাটা জালে আটকা পড়ে গেলে—তার ওপর আবার ওদের তীর চালনা। বিষাক্ত তীর। অতএব শেষ পর্যন্ত গরিলাটাই কাবু হয়ে পড়ল।

উত্তরের দিকের গরিলাটার ওই অবস্থা দেখে দক্ষিণদিকে যে গরিলাটা আসছিল, ওটা, সাংঘাতিক ক্ষেপে গেল। চোখ দুটো ওর জ্বলতে লাগল আগুনের হল্কার মতো। মনে হো'ল যেন এইমুহূর্তে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস করে ফেলবে। পিগমীদের ডেরাগুলো তছনছ করতে লাগল। ছেলে মেয়েদের দলে-পিষে মারতে লাগল। পিগমীরাও ভয়ে আঁৎকে উঠলো। ওরা হৈ চৈ চেঁচামেচি করতে করতে জাল নিয়ে এদিক ওদিক করতে লাগল। আর বিষাক্ত তীরগুলো ছুড়ে মারতে লাগল। গরিলাটা তীব্র গর্জন করে এগিয়ে আসতে আসতে গাছগুলো মড় মড় করে ভেঙ্গে ছুঁড়ে মারতে লাগল পিগমীদের দিকে।

পটলবাবু গরিলাটার দিকে একবার তাকিয়ে, 'ভয়ঙ্কর' বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। টেনিদা বন্দুক নিয়ে কাঁপতে লাগলেন। আমার আর যজ্ঞেশ্বরবাবুর অবস্থাও খুব ভাল নয়। এ্যাডভেঞ্চারের সখ মন থেকে উবে গেছে, শিকার করার স্পৃহাও নেই।

পিগমীদের চেষ্টার অন্ত নেই। জাল নিয়ে এই গরিলা-টাকেও ঘিরে ধরল, জালে জড়িয়েও গরিলাটা তীব্র গর্জন করে উঠল। চারিদিকে একটা হৈ হৈ ব্যাপার। তার মধ্যেও জল ছিটিয়ে পটলবাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হো'ল। কারণ সে-রকম সাংঘাতিক বিপদ বুঝলে দলবল নিয়ে পালাতে হবে। এই গরিলাটাকে জালে বেশীক্ষণ আটকানো গেল না। জাল ছিঁড়ে ফেলল। তারপর সে কী গর্জন—আর বুক থাপড়ানো। চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বুক থাপড়াতে থাপড়াতে গরিলাটা এগিয়ে এলো। পিগমীদের বিষাক্ত তীরও ওর গতিবেগকে মন্থর করতে পারলনা। পিগমীদের তো রক্ষে নেই—আমাদেরও রক্ষে নেই।

গরিলার চেহারাটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তীরগুলো বেঁধায় জায়গায় জায়গায় রক্ত ঝরছে।

আর দেরী নয়। আমরা দলবল নিয়ে পালাতে লাগলুম। এক দুই তিন। কিন্তু পালাব বললেই পালান যায় না। গরিলাটা দৌড়ে এসে টেনিদাকে শূন্যে তুলে ফেলল, এবার বোধ হয় ঘাড় মটকে দূরে ছুঁড়ে ফেলবে। না, আর দেরী নয়। টেনিদাকে বাঁচাতে হবেই। আমার বন্দুক গর্জে উঠল গুড়ুম—গুম্। সঙ্গে সঙ্গে আরো ন'টা বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল। গুড়ুম্—গুড়ুম্ গুম্।

গরিলাটা টেনিদাকে একপাশে রেখে, গর্জন করতে করতে আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এলো।

আবার আমাদের সকলের বন্দুক এক সঙ্গে বন কাঁপিয়ে গর্জে উঠল। গরিলাটা তীব্র চীৎকার করে একপাশে গড়িয়ে পড়ল। পিগমীরা আনন্দে চীৎকার সুরু করল। গরিলাটার ওপরে উঠে, নাচানাচি সুরু করল। আমরা টেনিদাকে তুলে নিয়ে এলুম। টেনিদার আঘাত গুরুতর। যজ্ঞেশ্বরবাবু প্রাথমিক শুশ্রূষা শেষ করলেন। প্রাণের ভয় অবশ্য নেই, তবু সতর্ক থাকতে হবে।

তাঁবু গুটিয়ে ফেললেও, আমরা হাতমুখ ধুয়ে, খাবার দাবার খুলে বসলুম। ইচ্ছে ব্রেকফাষ্ট ঐখানেই সেরে নিয়ে আবার

চলা। কংগোর জঙ্গলে—এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। পিগমীদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারের বেশ কয়েকদিন ধরে আর অভাব হবে না। একটা অজগর সাপ, আর দুটো পেল্লায় গরিলা খেয়ে শেষ করতে ওদের বেশ কয়েকদিন লাগবে। অবশ্য পিগমীদের গুষ্টিও কম নয়। তা' প্রায় এখানেই তিনশো পিগমী রয়েছে। আজকের গরিলা যুদ্ধে অবশ্য ওদের প্রায় বিশ জন প্রাণ দিয়েছে। তবু মৃত্যুতে, ওরা নির্বিকার। মৃত্যু আসবেই। এর জন্যে ওরা দুঃখিত নয়।

যজ্ঞেশ্বরবাবু ডিম-সেদ্ধ আর পাউরুটি খেতে খেতে পটল-বাবুকে বললেন: পটলবাবু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আপনাকে আবার পিগমীরা ব্রেক-ফাস্ট করতে ডাকতে পারে।

আমরা সবাই অতো দুঃখেও হো হো করে হেসে উঠলুম।

পটলবাবু বললেন: আজ আর আমি ওদের ওখানে ব্রেকফাস্ট করতে যেতে রাজী নই—তা ফল যতই মন্দ হোক।

টেনিদাকে আমার বোতল থেকে ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিলুম, টেনিদাও একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন।

পটলবাবু বললেন: টেনিদা সত্যি আপনার আয়ু আছে, যমের হাত থেকে বেঁচে এলেন।

পাউরুটি আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে, আমরা সবে চায়ের জল ষ্টোভে চাপিয়েছি, এমন সময় আবার পিগমীদের হৈ চৈ শুনতে পেলুম। তীর ধনুক নিয়ে ছুটোছুটি করে সব দক্ষিণের দিকে সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে।

পটলবাবু বললেন: আবার হৈ চৈ কেন?

আফ্রিকান ছেলেটি বলল: দক্ষিণের দিকে চেয়ে দেখুন, প্রায় এক ডজন গরিলা এদিকে ছুটে আসছে।

অতএব আমরা যঃ পলায়তি সঃ জীবতি নীতি ধরলুম। গরিলার সঙ্গে গরিলা যুদ্ধে পারবো কেন? পিগমীরা হয়ত গরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের পালাতে হবে। উত্তর দিক ধরে আরো উত্তরে। চা আর খাওয়া হো'ল না। ষ্টোভগুলো সব নিভিয়ে ফেলে, আমরা পালাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিলুম।

আফ্রিকান ছেলেটি বলল: গরিলাদের পিগমীদের কাছে আসতে এখনও দশ মিনিট সময় লাগবে। তারপর ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করবে। ততক্ষণে আমরা অনেক দূর পালিয়ে যেতে পারব। অতএব আর এক মিনিটও দেরী করলে চলবে না। আমরা উত্তরের দিকে ছুটে চললুম; লতা-পাতা, গাছপালার মধ্যে দিয়ে। অনেকের পা-হাত ক্ষত-বিক্ষত হলো। সেদিকে আমাদের কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। হয়ত বা সাপকে মাড়িয়েও চলে এলুম। আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য—গরিলার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। প্রায় আধঘন্টা ছোটার পর আমরা এক বিরাট প্রান্তরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্রান্তরটা তিন-চার মাইল এদিকে ওদিকে ফাঁকা। উদ্দেশ্য, তাঁবু ফেলে দুপুরের মতো ওখানে লাঞ্চ সেরে নিয়ে আবার চলা। কারণ কংগোর জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আমাদের পৌঁছতে হবে।

॥ দুই ॥

তবে ওই বিরাট প্রান্তর আমাদের দেশের সবুজের প্রান্তরের মতো শ্যামল নয়, হলদে। মনে হোল সারা প্রান্তর জুড়ে হলদে গালিচা পাতা। আফ্রিকান ছেলেটি কিছুটা দূর দিয়ে ঘুরে এসে বলল: জায়গাটা খুব সুবিধের নয়। এ জায়গায় সিংহের আনাগোনা আছে। অনেকগুলো সিংহের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। অতএব খাওয়া-দাওয়া চট্‌পট্‌ সেরে নিয়ে এ জায়গা ছেড়ে আবার এগিয়ে চলতে হবে।

পটলবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: কংগোর জঙ্গলে কোথায়ও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই। গরিলার পরেই আবার সিংহ।

প্রথমেই চায়ের জল ষ্টোভে চাপান হো'ল।

আমি বললুম, আগে চা'তো খেয়ে নি! তেমন বুঝলে, দুপুরের খাওয়া বিকেলে খেতে হবে, তাও অন্য জায়গায় গিয়ে, সবাই মিলে চা খেয়ে নিলুম।

দূরবীন দিয়ে দূরে তাকিয়ে দেখলুম, জেব্রারা সব চরে বেড়াচ্ছে। ডোরা ডোরা দাগ কাটা ঘোড়া। ঘোড়ার মতো, অথচ জেব্রার গাড়ী নেই। জেব্রার দৌড়ও নেই। দেখতে মন্দ লাগছিল না।

চা-খাওয়ার পর, রান্নার কাজে লেগে গেলুম। কিছু আলু আমরা সঙ্গে এনেছিলুম। চালও প্রায় দু'মণ। আলু-সেদ্ধ ভাত ষ্টোভে বসিয়ে দিলুম। পটলবাবু আবার সঙ্গে তাস

এনেছিলেন। কয়েকজনকে পাহারায় রেখে আমরা তাস খেলতে বসে গেলুম। কথায় বলে, তাস-দাবা-পাশা, এই তিন সর্বনাশা। খেলতে খেলতে আমরা এতোই মাতোয়ারা হয়ে গেলুম যে, কংগোর জঙ্গলে বসে তাস খেলছি একথা সবাই ভুলে গেলুম। আমরা যেন যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে তাস খেলছি।

হঠাৎ আমাদের নেপালের গোপাল চেঁচিয়ে উঠল : হুজুর, সিংহ। আফ্রিকান ছেলেটিও চেঁচিয়ে উঠল : লায়ান, লায়ান।

দূরে তাকিয়ে দেখলুম, জেব্রার দল ছুটোছুটি করছে। একটা জেব্রার ঘাড়ে সিংহ লাফিয়ে পড়ল। জেব্রাটা সিংহটাকে ঘাড়ে করেই কিছুক্ষণ ছুটল। তারপর আর পারল না। সিংহটা জেব্রাটাকে টেনে নিয়ে চলল। আহা বেচারা জেব্রা!

দূরে টিলার ওপর আরো চার-পাঁচটা সিংহ। বোধ হয় আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এতোগুলো দ্বিপদ জন্তুর লোভ সামলাতে পারবে কি করে। কি যে করব কিছুই স্থির করতে পারলুম না। দলের নেতা হয়েও মুস্কিলে পড়েছি।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন : রান্নাভাত না খেয়ে, পাদমেকং ন গচ্ছামি। আমি এক পাও যাব না। আমার পেটে খিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাছাড়া যেতে হ'লে সিংহদের কাছ দিয়েই যেতে হবে। ওরা আমাদের যেতে নাও দিতে পারে। অতএব ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই যেতে হ'বে। যুদ্ধ যখন করতেই হ'বে, তখন খেয়ে দেয়েই যুদ্ধ করব।

টেনিদাও যজ্ঞেশ্বরবাবুর প্রস্তাবই সমর্থন করে বললেন : গরিলার হাত থেকে যখন বেঁচে এসেছি। তখন আর আমি সিংহদেরও মোটেই ভয় করি না। লড়ব ওদের সঙ্গেও। লড়কে লেঙ্গে সিংহস্থান।

হঠাৎ দূরে সিংহের গুরুগম্ভীর গর্জন শুনে, টেনিদা থেমে গেলেন। টেনিদার বক্তৃতা বন্ধ হয়ে গেলো। আগের সিংহটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর একটা সিংহ গর্জন করে জানাল : এটা আমাদের রাজত্ব, তোমরা ঢুকে মহা অন্যায় করেছো।

সিংহের গর্জন শুনে, যজ্ঞেশ্বরবাবু গোঁফে তা দিতে ভুলে গেলো, পটলবাবুর পিলে চমকে গেলো, টেনিদার হাত থেকে নস্যির কৌটো পড়ে গেলো, নেপালের গোপাল কাঁপতে লাগল।

শুধু সেই আফ্রিকান ছেলেটি বলল : যতো গর্জায়, ততো বর্ষায় না। ওই গর্জনে ভয় পেলে চলবে না, কারণ এখান থেকে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াও বিপদ। এখানে তবু, আমরা ঘাঁটি করে বসে আছি। অতএব ঠিক হলো রান্না হয়ে গে'লে তিনজন করে একসঙ্গে খাবে। আর সবাই চারিদিকে দাঁড়িয়ে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেবে।

পটলবাবু রসিক ব্যক্তি, সিংহের গর্জনে পিলে চমকে উঠলেও রসিকতা করতে ছাড়লেন না, বললেন : এটা সত্যিই বন-ভোজন। বনে-ভোজন। সিংহেরাও আমাদের ভোজনের জন্যে তৈরী। জেব্রার দিকে ওদের দৃষ্টি নেই।

পটলবাবুর কথাই সত্যি। ওদের পাশ দিয়ে একদল বোকা

জেব্রা চলে গেলো, কিন্তু সিংহেরা ওদের দিকে দৃক্‌পাতও করলো না, আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

যজ্ঞেশ্বরবাবু সিংহ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন: পটলবাবু বললেন: ওদের বোধ হয় এখন খিদে নেই। ব্রেকফাষ্ট হয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়ার সময় এখনও হয় নি। খিদে না পেলে ওরা কোন জন্তু হত্যা করে না।

পটলবাবু যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথার উত্তরে বললেন: ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রাখতেও পারে? তা না হলে আমাদের দিকে ও-রকম হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে কেন?

ছোটবেলা আমিও বাবার সঙ্গে মিষ্টি-দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় শো-কেশের ভেতরকার রসগোল্লা আর লেডিকেনীর দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকতুম। এমন কি বিয়েবাড়ী থেকে নেমতন্ন খেয়ে ফেরার পথেও ওই রকম তাকিয়ে থাকতুম।

নেপালের গোপাল আলুসেদ্ধ ভাত কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে নামিয়ে ফেলল। হঠাৎ একটি নিগ্রো কুলী চেঁচিয়ে উঠল। একটা সিংহ দেখলুম, আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমে বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে চলে এলো।

টেনিদার বন্দুক সবার আগেই গর্জে উঠল। সিংহটা বিকট গর্জন করে একটা কুলীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্দুকও গর্জে উঠল। তারপর যজ্ঞেশ্বরবাবুর এবং পটলবাবুর। সিংহটা অবশ্য মরল, কিন্তু কুলীটাকে বাঁচানো গেল না। লাল-তাজা-রক্ত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দূরের

জেব্রারা চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। ওপাশের সিংহগুলোও চঞ্চল হয়ে উঠল।

দূরের বনে শিম্পাঞ্জিগুলো চেল্লাচেল্লি আরম্ভ করল। কুলীটার মৃত্যুতে আমাদের মনও মুষড়ে পড়ল। এই প্রথম আমাদের দলের একজন প্রাণ হারাল। নিগ্রোটা নেটিভ খ্রীষ্টান। ওখানেই গর্ত করে, ওকে সমাধিস্থ করা হো'ল, এবং সমাধির ওপর আমরা ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দিলুম। তারপর প্রায় দু'মিনিট মৌন থেকে মৃতের আত্মার সদ্গতি কামনা করলুম।

আফ্রিকান ছেলেটি বলল: এখানে রাত্রিবাস করা কোনমতেই শোভন হবে না, অতএব আমাদের আরো সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে।

অতএব কোন রকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে, আমরা জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলুম। আবার রওনা হ'তে হবে। এ পথ কোথায় শেষ হবে জানি না। আরো কত বিপদ ঘটবে, তাও জানি না।

আমরা আবার চলা সুরু করলুম, শুধু একজন কুলী রইল সিংহের রাজত্বে। তবু আমাদের সান্ত্বনা—সিংহটাকেও আমরা খতম করেছি।

টিলার কাছাকাছি আসতেই, মেঘ-গর্জনের মতই, আবার গর্জন শুনতে পেলুম। টিলার ওপর কেশরযুক্ত পশুরাজ দাঁড়িয়ে। আবার সিংহের পাল্লায় পড়লুম।

পশুরাজ কারো ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার আগেই আমার বন্দুক গর্জে উঠল। তবু পশুরাজ দমল না, আমাকেই তাক

করে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল। আর একটু হ'লে আমার ঘাড়েই পড়ত, আমি চোখের পলকে সরে দাঁড়িয়েছিলুম। একসঙ্গে আমাদের চারজনের বন্দুক গর্জে উঠল। পশুরাজ বিকট গর্জন করে একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল। সত্যিই পশুরাজ। রাজার মতোই চেহারা! রাজকীয় গাম্ভীর্য্য মরবার পরও বিদ্যমান।

আমাদের মধ্যে থেকে একটা কুলী কাঁচি নিয়ে সিংহের কেশর কাটতে লাগল। আমরা বাধা দিই নি। আমাদের সঙ্গের সেই আফ্রিকান ছেলেটি বলল: সিংহের কেশর সংগ্রহ করা টুংগা নিগ্রোদের গর্বের বিষয়। সে হাজার জনের মধ্যে একজন হবে। এতো সহজে তো সিংহের কেশর সংগ্রহ করা যায় না। অতএব কুলীটা এ সুযোগ ছাড়তে মোটেই রাজী নয়। আবার সকল সিংহেরই কেশর থাকে না।

কিন্তু পশুরাজের কেশর পুরোপুরি সংগ্রহ করা কুলীটার ভাগ্যে আর ঘটল না। ওপরের টিলা থেকে আর একটা সিংহ কুলীটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা এর জন্যে তৈরী ছিলুম না। সবাই বন্দুক নামিয়ে বসেছিলুম। অতএব এ-কুলীটার অবস্থা আগের মতোই হো'ল। সিংহের কেশর সংগ্রহ করা আর হয়ে উঠল না। তার আগেই ওকে প্রাণ দিতে হো'ল। ওপরের টিলার সিংহটা বোধ হয় পশুরাজেরই অনুচর ছিল। পশুরাজের কেশর কাটার মতো অপমান টিলা থেকে দেখে আর সহ্য করতে পারে নি! সংগ্রহকারী কুলীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চোখের পলকে এতগুলো শিকারীর সামনে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। আর একটা কুলীর জীবনাবসান হো'ল।

অবশ্য সিংহটাও শেষ পর্যন্ত জীবন্ত ফিরে যেতে পারল না, পশুরাজের সম্মান রাখতে এসে বীরের মতো প্রাণ দিল। সিংহটা যদি মানুষ হো'ত, তবে নিশ্চয়ই নাইটহুড পেতো, ওখানে একটা শহীদস্তম্ভও হো'ত।

চার পাঁচজনে মিলে ওখানেই গর্ত করে কুলীটাকে সমাধিস্থ করলাম।

তবে যারা কাজ করছিল, তারা কয়েকজন বাদে আমরা অন্য সবাই বন্দুক উঁচিয়ে পাহারায় রইলুম, যাতে আবার কোন অঘটন না ঘটে।

বলা বাহুল্য, সিংহের কেশরটাও কুলীটার সমাধির মধ্যে ফেলে দেওয়া হোল। সমাধির ওপর আমরা আগেকার মতোই ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিলুম।

তারপর আবার আমাদের চলা সুরু হো'ল। প্রান্ত পেরিয়ে এসে আবার গভীর জঙ্গলে পড়লুম। এমন গভীর জঙ্গল যে, বেলা তিনটের সময় টর্চ জ্বালিয়ে পথ চলতে হো'ল। সে পথ দুর্গম, লতাপাতায় জড়ানো। অনেক সময় জঙ্গল কেটে কেটে পথ পরিষ্কার করে চলতে হো'ল।

তারপর আবার কিছুটা এগোবার পর আর এক উপদ্রব সুরু হো'ল। শুধু বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। সে বৃষ্টির কথা কোলকাতায় বসে চিন্তা করা যায় না। পাতায় পাতায় সে-বৃষ্টির সাড়া। পথ চলতে হ'লে—পা পিছলে পড়তে হয়। একবার

পা পিছলে গেলে, একেবারে বিপথে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। ওখান থেকে আর জীবনে ওপরে ওঠা সম্ভব হবে না। পোকা-মাকড়-সাপ অজস্র। অবশ্য আরো সুন্দর জিনিস কংগোর জঙ্গলে আছে, তা হচ্ছে বিচিত্র বর্ণের পাখি। অদ্ভুত সুন্দর ওরা। কত রঙ-বেরঙের। কতো অদ্ভুত শব্দ বেরোয় ওদের মুখ থেকে। দু'একটা নমুনা দিচ্ছি। কাট্—কাট্—কাট্—কটাং কট। কট্কট্ কট্ কট্।

সাপও বিচিত্র ধরনের। বেশীর ভাগই বড় জাতের। ছোট জাতের সাপও অবশ্য আছে, তবে তারা জঙ্গলের সঙ্গে মিশে থাকে। অতো গভীর জঙ্গলে ছোট জাতের সাপ, একেবারে চোখের সামনে না পড়লে খুঁজে বের করা মুস্কিল।

অনেক কষ্টে আমরা চলতে লাগলুম। জঙ্গল আর জঙ্গল। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ভাগ্যিস্ আমাদের সঙ্গে ওয়াটার-প্রুফ ছিল, তা না হ'লে আমরা এতক্ষণে ভিজে ঢোল হয়ে যেতুম।

পটলবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন : শিকার আমার থাক, পয়সা আমার মাথায় থাক্। গতজন্মে পাপ না করলে কেউ এ-পথ মাড়ায় না। না জানি গতজন্মে কত পাপ করেছিলুম, তাই এ-শাস্তি!

পটলবাবু দু'বার কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন, যজ্ঞেশ্বরবাবু তিনবার গড়িয়ে পড়লেন, টেনিদা একবার, নেপালের গোপাল তো ওয়াটার-প্রুফ নিয়ে একেবারে কাদায় মাখামাখি করে নিল, আমি একবার পড়তে পড়তে কোনরকমে আফ্রিকান ছেলেটির হাত ধরে বেঁচে গেলুম।

আফ্রিকান ছেলেটির কথা এক্ষেত্রে একটু বলা দরকার। ছোটবেলায় ছেলেটি বাবা-মা হারিয়েছে। মা গেছে সিংহের পেটে, বাবা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ছোটবেলায় ছেলেটিকে মিশনারীরা মানুষ করেছে।

লেখাপড়া শিখিয়েছে ছেলেটাকে। ছেলেটা অবশ্য পরে একটা রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে। অর্থের অভাবে ওরা অবশ্য তেমন কিছু করতে পারবে না। তবু ওদের স্বপ্ন বিদেশীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা। ছেলেটি বলল ঃ অনেকদিনের ঘুম থেকে আফ্রিকা জাগবে। ছেলেটি সেই জাগ্রত আফ্রিকারই স্বপ্ন দেখে। সেই রাজনৈতিক দলের জন্যই অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে—ছেলেটি শিকারীদের সঙ্গে জীবন বিপন্ন করেও ঘুরে বেড়ায়। ছেলেটির তেজ ও শক্তি অপরিসীম। তবে শক্তির অপব্যবহার সে করে না। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সেই বৃষ্টি-ঝরা জঙ্গলের পথ দিয়ে চলছিলুম। পটলবাবু অধৈর্য হয়ে বললেন ঃ এ জঙ্গলের কি শেষ নেই ? শুধু কি পথ চলবই ?

যজ্ঞেশ্বরবাবুও গোঁফে তা দিয়ে বললেন ঃ না, এভাবে এ-রকম কাদায় খাস-কোলকাতার লোক হয়ে পথ চলা সত্যিই মুস্কিল।

টেনিদা যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথা শুনে মুখ বিকৃত করে বললেন ঃ থাকেন তো মশায়, বালীতে—বালী কি খাস-কোলকাতায় ? আপনি তো আর শ্যামবাজারের শশীবাবু নন্। আমি মশায় থাকি টালায়। টালা থেকে শ্যামবাজার তো বেশী দূর নয়— আমি বরং খাস-কোলকাতার লোক বলে দাবী করতে পারি।

আফ্রিকান ছেলেটি মুচকি হেসে বলল ঃ ঝগড়া করে কোন

লাভ নেই। এখানে বিশ্রাম নেওয়া, বা তাঁবু ফেলার মতো কোন জায়গা নেই। বেশী রাত হওয়ার আগেই আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবেই—তা অতো গাছ কেটে ফাঁকা জায়গা করে নেওয়াও সম্ভব নয়।

অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার সবাইকে পথ চলতে হোল। কিছুদূর গিয়ে দেখলুম, গাছের মাথাগুলো কালোয় কালোয় ঢাকা।

পটলবাবু ওপরের কালো লোমশ জন্তুদের দিকে তাকিয়ে বলল: আবার গরিলার পাল্লায় পড়লুম না তো! গরিলার ছোটভাই শিম্পাঞ্জি।

ওপরে তাকিয়ে দেখলুম, শুধু শিম্পাঞ্জি আর শিম্পাঞ্জি।

আফ্রিকান ছেলেটি বলল: শিম্পাঞ্জিরা এমনিতে ভালো, আর মানুষের খুব বন্ধু। কিন্তু ওদের একটাকে গুলী করলে আর এ বন থেকে বেরোন যাবে না। এ বনে ওরা সংখ্যায় খুব নগণ্য নয়।

ওপরের দিকে চেয়ে দেখলুম, প্রায় চার-পাঁচশ' শিম্পাঞ্জি।

ওই দল একসঙ্গে রুখে দাঁড়ালে বন্দুক নিয়েও এই বন থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুস্কিল হবে। শিম্পাঞ্জিগুলো অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

অদ্ভুত কিচির-মিচির শব্দ। চিড়িয়াখানায় আমরা ওদের দেখতুম, আজ মজা করে ওরা আমাদের দেখতে লাগল। একটা শিম্পাঞ্জি ঝুলে এসে একেবারে পটলবাবুর ঘাড়ে চেপে বসল। আর একটা শিম্পাঞ্জি ঐ আগের শিম্পাঞ্জিটার দেখাদেখি

যজ্ঞেশ্বরবাবুর ঘাড়ে এসে বসল, আর একটা আবার নেপাল গোপালের কাঁধে।

নেপালের গোপাল কাঁধের ওপর ওরকম রোমশ জন্তুর অস্তিত্ব পেয়ে প্রথমটা ঘাবড়ে গেল : উরে বাবা গেছিরে।

টেনিদা বললেন : ভয় নেই নেপালকে গোপালরে ! তারে কাঁধে গরিলা নয়, শিম্পাঞ্জিরে।

তাছাড়া পটলবাবু ও যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাঁধে শিম্পাঞ্জি দেখে টেনিদা মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন : আত্মীয়রা আত্মীয়কে চেনে।

হঠাৎ দেখলুম, টেনিদার ঘাড়েও একটা শিম্পাঞ্জি এসে ঝুপ করে পড়ল। শুধু ঝুপ্ করে পড়া নয়, ঝুপ্ করে পড়েই টেনিদার গালে টেনে এক চড় মারল।

এবার পটলবাবু ও যজ্ঞেশ্বরবাবু বলবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। প্রথমে পটলবাবুই সুরু করলেন : কি টেনিদা, আপনার গার্ডিয়ান যে আপনাকে এসেই টেনে এক চড় মারল ?

টেনিদা অবশ্য পটলবাবুর মন্তব্যে চুপসে যাওয়ার পাত্র মোটেই নন্—মারবে না ? আপনাদের যে ওদের আত্মীয় বলেছিলুম। আপনাকে আর জগুবাবুকে ওরা আত্মীয় করতে মোটেই রাজী নয়।

এবার পটলবাবুর কাঁধে যে শিম্পাঞ্জিটা বসেছিল, সেটা পটলবাবুর কান টানতে লাগল। পটলবাবু রেগে গিয়ে বলল, তোমাদের রাজত্বে এসেছি, কাঁধে চেপে বসেছো, আবার কান নিয়ে টানাটানি কেন ?

আর যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাঁধে যে শিম্পাঞ্জিটা বসেছিল, সেটা গোঁফ নিয়ে টানাটানি স্বরু করল। টেনিদা এবার খুশির হাসি হেসে মন্তব্য করলেন: যজ্ঞেশ্বরবাবু, আপনাকে আর গোঁফে তা দিতে হচ্ছে না, গোঁফে তা দিচ্ছে শিম্পাঞ্জি।

যজ্ঞেশ্বরবাবু শিম্পাঞ্জির গোঁফ টানাটানিতে বিরক্ত হয়ে বললেন: এ তো আর গোঁফে তা নয়—গোঁফ নিয়ে দস্তুরমতো টানাটানি। হাসবেন না টেনিবাবু—এর জন্যে বলে কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ! আমি বলে গোঁফ টানাটানিতে অস্থির হয়ে পড়লুম, আর আপনারা হাসাহাসি করছেন?

শিম্পাঞ্জির উদ্দেশ্যে যজ্ঞেশ্বরবাবু অনুনয়-বিনয় করে বললেন: গোঁফ নিয়ে টানাটানি করো না, বাবা! গোঁফে বড় লাগছে। বেশী টানাটানি করলে, শেষে কিন্তু হ্যাচ্চো দিয়ে দেবো! তখন আমাকে দোষারোপ করো না।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর অনুরোধ শিম্পাঞ্জিটা মোটেই কর্ণপাত করল না, বরং আরো জোরে টানাটানি শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত যজ্ঞেশ্বরবাবু সত্যিসত্যি একটা হ্যাচ্চো দিলেন, এবার শিম্পাঞ্জিটা ভয় পেয়ে পালাল।

ওপরের শিম্পাঞ্জিগুলো হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো। একটা শিম্পাঞ্জি আবার ঝুপ করে আমাদের সামনে পড়ে রক-এন-রোলের মতো নাচতে লাগলো। পটলবাবু ওই নাচ দেখে চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে বলল: এরা আবার রক-এন-রোল শিখল কি করে? এখানে তো এলভিস প্রিগ্‌লি আসেনি!

যজ্ঞেশ্বরবাবু মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন : ওরা বোধহয় কোন হিন্দী সিনেমা দেখেছে !

পথশ্রমে আমরা অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। জঙ্গুলে-পথ তো আর সহজ-সরল নয়। কিন্তু পটলবাবু, টেনিদা আর যজ্ঞেশ্বর-বাকবুাণ্ড-কারখানায় আর রসালাপে পথশ্রম সবারই অনেকটা কমে গেল। অবশ্য শিম্পাঞ্জিদেরও কৃতিত্ব কম নয়

কিছুক্ষণ পর আমরা শিম্পাঞ্জিদের এলাকা ছাড়িয়ে চলে এলুম। শিম্পাঞ্জিরা কাঁধ থেকে নেমে গাছে ফিরে গেল।

আমরা টা টা করে ওদের বিদায় দিলুম। এতক্ষণ ওদের সঙ্গে বেশ মজা করে কাটিয়ে দিলুম, আবার পথ আমাদের কাছে দুর্গম হয়ে উঠল।

চলছি তো চলছিই। কিন্তু জঙ্গলের শেষ নেই। আমরা আরো গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম। সে জঙ্গলে টর্চ না জ্বালিয়ে রাস্তা চলার উপায় নেই। অতএব টর্চ জ্বালিয়ে পথ চলতে হোল। হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরবাবু পা ফসকে একবারে গভীর খাদে পড়ে গেলো। তা ছাড়া যজ্ঞেশ্বরবাবু পথ চলার শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, আর বয়েস তো কম হয়নি। নেহাৎ সাহস আছে বলেই কংগোর জঙ্গলে শিকার করতে এসেছেন।

আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে পড়লুম। খাদটা অবশ্য খুব গভীর নয়, তিনশ' ফুট হবে। আমরা টর্চের আলো ফেলে অনুমান করে নিলুম। খাদের নীচে ফোকাস করে দেখলুম, যজ্ঞেশ্বরবাবুর দেহ খাদের নীচে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। আমাদের সঙ্গে বড় দড়ি ছিল, কংগোর জঙ্গলে আসব বলে

আমরা সব দিক থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলুম। অতএব একটা বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়িটা বেঁধে খাদের তলদেশে ফেলে দিলুম। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবু উঠবেন কি করে? তার কি চেতনা আছে! অতএব আমি আর সেই আফ্রিকান ছেলেটি দড়ি ধরে নীচে নেমে গেলুম।

খাদের নীচটাও ছোট ছোট ঝোপে ভর্তি। আমার সঙ্গে ফ্লাস্কে জল ছিল, তা চোখে-মুখে ছিটিয়ে কোনরকমে যজ্ঞেশ্বর-বাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলুম। যজ্ঞেশ্বরবাবু জ্ঞান ফেরার পর চারিদিকে তাকিয়ে বললেনঃ আমি কি খাদে পড়ে গিয়েছিলম?

আমি বললুমঃ হ্যাঁ!

ঃ আপনারা দু'জন! আর অন্যেরা কোথায়?

ঃ তারা সব ওপরে। আমরা দু'জন আপনি খাদে পড়ে যাওয়ার পর ওই দড়ি বেয়ে নেমেছি। আর দেরী করে কাজ নেই, চলুন ওঠা যাক্। এখনও কিছু হাতে সময় আছে। যত তাড়াতাড়ি হোক এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, ততই মঙ্গল।

অতএব আগে যজ্ঞেশ্বরবাবু, তারপর আমি, তারপর সেই আফ্রিকান ছেলেটি দড়ি বেয়ে উঠতে লাগলুম। অবশ্য আমাদের তিনজনের ভারে দড়ি ছিঁড়ে পড়বার জো নেই। বেশ শক্ত আর মজবুত দড়ি। এই ধরনের কাজে লাগবে বলেই, দড়িটা আমরা বুদ্ধি করে সঙ্গে এনেছিলুম। আমরা দড়ি ধরে প্রায় একশ' ফুট উঠেছি। হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরবাবু আঁতকে চীৎকার করে উঠলেন। আমি টর্চের আলো ওপরে ফোকাস করে দেখলুম,

প্রায় দুশ' ফুট ওপরে একটা গর্ত থেকে এক বিরাট সাপ লেলিহান জিহ্বা বের করে দড়ির পাশ দিয়েই হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে নীচের দিকে নেমে আসছে।

আমি আর যজ্ঞেশ্বরবাবু ওই রকম সাংঘাতিক বিপদে বুদ্ধি হারিয়ে ফেললুম—দড়ি ধরে আঁকড়ে রইলুম। কি যে করব কিছু বুঝতে পারলুম না।

আফ্রিকান ছেলেটি বলল: তাড়াতাড়ি আবার নীচে নামুন। ও সাপকে না মেরে আর ওপরে ওঠার উপায় নেই।

আমরা তিনজনেই আবার খাদের তলদেশে এসে পৌঁছলুম। ওপরের সাপটা লেলিহান জিহ্বা বের করে দড়িটাকে জড়িয়ে জড়িয়ে নীচে নামছে। চোখ দুটো ওর নীলকান্ত মণির মতো জ্বলছে।

প্রায় আমাদের পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে সাপটা চলে এলো।

আর দেরী নয়! আফ্রিকান ছেলেটি টর্চের আলো ফেলল, সাপটার ঠিক মাথার ওপর। মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। গুলিটা মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সাপটা কিছুক্ষণের জন্য থমকে রইল, তারপর ক্রুদ্ধ আক্রোশে তীর বেগে নীচের দিকে নামতে লাগল।

আবার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। যজ্ঞেশ্বরবাবুও পিস্তল বের করে তৈরী হয়ে রইলেন। সাপের মাথাটা এসে আছড়ে পড়ল একেবারে আফ্রিকান ছেলেটির সামনে। আফ্রিকান ছেলেটি একলাফে কয়েক গজ এগিয়ে চলে এলো। তাতেও রক্ষে নেই। সাপটার লেজটা এসে পড়ল—আফ্রিকান

ছেলেটির কাঁধে। সাপটা তখনও মরেনি, একবার আফ্রিকান ছেলেটিকে লেজ দিয়ে জড়ালে ওর আর বাঁচার উপায় থাকবে না। আফ্রিকান ছেলেটির গায়ে হাতীর মতো জোর। দুহাত দিয়ে সাপের লেজটাকে দূরে সরিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে, যাতে সাপটা তার গলা জড়িয়ে না ধরতে পারে। আর এদিকে যজ্ঞেশ্বরবাবু আবার গুলি করলেন, সাপের মাথা লক্ষ্য করে। সাপটা নিশ্চল হয়ে পড়ল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আফ্রিকান ছেলেটিও অক্টোপাশের বন্ধন মুক্ত হোল।

আমরা তিনজন ওপরে উঠে এলুম। এতক্ষণ সত্যি আমরা তিনজন সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে লড়াই করে এলুম।

একটু বিশ্রাম করে আবার চলতে লাগলুম। কিছুদূর এসে দেখলুম জঙ্গলটা ফাঁকা। শুধু কলাবাগান আর কলাবাগান। আর গাছে গাছে কলার কাঁদি। আফ্রিকান ছেলেটি বলল : এই কলাবাগান জায়গাটা দেখতে ভালো হ'লেও আসলে মোটেই নিরাপদ নয়। এখানে একদল বেবুন আর হিংস্র বানরদের আড্ডা। বেবুনেরা. তবু ভালো। এখানকার বানরগুলো সাংঘাতিক বদ্।

পটলবাবু আর যজ্ঞেশ্বরবাবু আফ্রিকার ছেলেটির কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন : গরিলা আর সিংহের সঙ্গে লড়াই করে এলুম, আর এরা তো সামান্য বাঁদর। বাঁদর আমাদের দেশেও আছে।

পটলবাবু ও যজ্ঞেশ্বরবাবু একটা কলার গাছ থেকে এককাঁদি কলা পেড়ে এনে মহানন্দে খেতে সুরু করলেন।

কিছুদূর এগিয়ে এসে দেখলুম তিনটি নরকঙ্কাল পড়ে আছে।

আফ্রিকান ছেলেটি বলল : এটা হচ্ছে তিনজন শিকারীর নরকঙ্কাল। গত বছর আমি একদল অষ্ট্রেলিয়ান শিকারীর সঙ্গে এখানে এসেছিলুম। এরাও সিংহ ও গরিলার সঙ্গে লড়াই করে এসেছিল। দল অনেক এগিয়ে গিয়েছিল—তিন জন সাহেব কলা খাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে, এখানে দেরী করে ফেলেছিলেন। অবশ্য আমি সাহেবদের সতর্ক করেছিলুম, এস্থান সম্বন্ধে। সাহেব তিনজন আমার কথায় মোটেই কর্ণপাত করেননি। প্রায় একঘন্টা পর আমরা সাহেব-দের পেছনে না দেখতে পেয়ে, ফিরে এসে দেখলুম : ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। প্রায় পাঁচশ' বানর সাহেবদের ঘিরে টুকুরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। তিনটি বন্দুক নিয়ে তো আর পাঁচশ' বানরের সঙ্গে লড়া যায় না!

আফ্রিকান ছেলেটির কথা শুনে আমরা সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেলুম। যজ্ঞেশ্বরবাবু আর পটলবাবুর কথা মুখে উঠল না। কলার কাঁদি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।. অবশ্য ওই সাহেবরা ছিল মাত্র তিনজন, আমরা কুলি ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ত্রিশ জন। পনেরটা বন্দুক আমাদের পনের জন শিকারীর সঙ্গে।

আরো কিছুদূরে এগিয়ে এসে সাংঘাতিক কিচির-মিচির শব্দ শুনলুম। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম প্রায় পাঁচশ' বানর। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। বানরগুলো আমাদের দেশের বানরদের মতো ছোট আকারের নয়। বেশ গোদা গোদা বানর। এক একটা বাচ্চা গরিলার মতো। সবার সামনে

ওদের দলপতি। দলপতির মুখটা সাংঘাতিক হিংস্র। চেহারাটাও সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর। অন্যান্য বানরগুলো আমাদের দেখে খেঁকিয়ে উঠল। এটা ওদেরই রাজ্য, আমাদের অনধিকার প্রবেশ করা ওরা সহ্য করতে মোটেই রাজী নয়। আস্তে আস্তে ওরা দলপতির নির্দেশে আমাদের প্রায় ঘিরে ধরল। আমাদের যেতে হবে সামনে। সামনে তাকালুম, সেখানেও একদল বানর। ডানপাশে তাকালুম, সেখানেও বানর। বাঁপাশে তাকালুম সেখানেও একদল বানর। পেছনে তাকালুম সেখানেও একদল বানর।

আমাদের যেতে হবে সামনের দিকে। পালের গোদাটাকে সামনের দিকে একদল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বানর নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জই করছে। বানরেরা যে এতো ভয়ঙ্কর হ'তে পারে—এর আগে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।

যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধ না করে একপাও এগোন যাবে না। আমরা সবাই বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়ে সার বেঁধে দাঁড়ালুম।

আফ্রিকান ছেলেটি বলল : আগে প্যালের গোদাটাকে শেষ করতে হবে।

এক-দুই-তিন। আমাদের পনেরটা বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল। পালের গোদা বানরটা চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলো। বানরেরা আমাদের এই আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। তবু ওরা পেছপা হোল না। আর একজন দলপতির স্থান অধিকার করে রুখে দাঁড়াল। ডানপাশের একটা গাছ থেকে একটা বানর আফ্রিকান ছেলেটির কাঁধে এসে পড়ে,

খামচি দিয়ে পিঠের খানিকটা মাংস তুলে নিলো।—আফ্রিকান ছেলেটির গায়েও হাতীর মতো শক্তি। বানরটাকে বাগিয়ে ধরে জোরে মারল এক আছাড়। বানরটা এক আছাড়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হোল। এবার নতুন দলপতি দল নিয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমাদের পনেরটা বন্দুক আবার একসঙ্গে গর্জে উঠল।

এবার অন্যান্য বানরগুলো ভয় পেয়ে সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। আমরা সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে প্রাণ-ভয়ে ছুটে দৌড়ে পালাতে লাগলুম। প্রায় আধঘণ্টা রুদ্ধশ্বাসে দৌড়বার পর আমরা একটা সবুজ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে চলে এলুম। সবাই মিলে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলুম—দূর থেকে প্রায় এক হাজার বানর দলবল নিয়ে আমাদের দিকে তীব্র আক্রোশে এগিয়ে আসছে। আফ্রিকান ছেলেটি বলল: আর ভয় নেই আমরা ওদের এলাকা পেরিয়ে এসেছি। ওরা এত দূর আসবে না।

তবু সাবধানের মার নেই। আমরা সবাই মিলে একবার পেছন ফিরে ফাঁকা আওয়াজ করলুম। ফাঁকা আওয়াজে কাজ হোল। বানরগুলো ভয় পেয়ে দূরে কলাগাছের বনের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। তবু বানরদের বিশ্বাস নেই, এ প্রান্তরে তাঁবু ফেলে রাত কাটানো চলবে না। সামনের নদীটা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

আমরা দলবল নিয়ে নদীর ধারে চলে এলুম। কিন্তু নদীর দিকে তাকিয়ে আমরা শিউরে উঠলুম। অনেক জলহস্তী

নদীর জলে গা ভাসিয়ে রয়েছে। যেমন বিরাট হাঁ, তেমন বিকট চেহারা। শুধু একটা নয়, অনেকগুলো জলহস্তী। একটা মানুষকে ওরা অনায়াসেই গিলে খেতে পারে। আমরা নদীর তীরে এসে অনেকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম। কি করব ভাবছি?

আফ্রিকান ছেলেটি বলল, এরকম করে থমকে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না, নদী পেরিয়ে যেতে হবে।

যজ্ঞেশ্বরবাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন: নদী পেরোন মানে জলহস্তীর পেটে যাওয়া। এরকম অপঘাতে মৃত্যু হবে আগে জানলে—কে আর কংগোর জঙ্গলে আসতো! শিকার আমার মাথায় থাক্। প্রতিজ্ঞা করলুম, জীবনে আর কখনো শিকারে বেরোব না।

পটলবাবুর অবস্থা আরো সাংঘাতিক, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গালে পড়ল, উনিও কাঁদতে কাঁদতে বললেন: ফিরেও যাওয়া যাবে না—সেই বানরগুলো ওৎ পেতে বসে আছে। এবার বাগে পেলে একেবারে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে! জলহস্তীগুলো তবু কপাত করে গিলে ফেলবে। কম কষ্ট। এই তো কোলকাতার চিড়িয়াখানায় কিছুদিন আগেও একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। একটা মেয়ে একটা জলহস্তীকে ছোলা খাওয়াচ্ছিল হাত বাড়িয়ে দিয়ে—জলহস্তীটা হাতকে বাগে পেয়ে মেয়েটার সারা দেহ টেনে নিয়ে গেছে। তারপর তো চিড়িয়াখানার রেলিংগুলো আরও উঁচু করেছে। আর এখানে একটা নয়, দুটো নয়—একেবারে পঞ্চাশ-ষাটটা জলহস্তী। একসঙ্গে আমাদের জলযোগ করতে ওদের আর কতক্ষণ?

পটলবাবু বাচ্চাছেলের মতোই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো, আমাদের নেপালের গোপালও সে কান্নায় যোগ দিলো।

টেনিদা পটলবাবুকে ধমক দিলো ঃ অত ছিঁচ্‌কাদুনে হলে কি চলে মশাই! অতই যদি প্রাণের ভয়, তবে ওই রকম পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে কংগোর জঙ্গলে এসেছিলেন কেন মশাই? এখনো জলহস্তীগুলো আমাদের উপস্থিতি টের পায়নি, ওরা জলকেলীতে ব্যস্ত। আপনার কান্নায় আরো বিপদ টেনে আনবে। বিপদে ধৈর্য হারালে চলবে কেন?

টেনিদার ধমকে পটলবাবু একটু শান্ত হ'লেন। নেপালের গোপালও কান্না থামালো। আমি আফ্রিকান ছেলেটির সঙ্গে যুক্তি করলুম ঃ এখান দিয়ে নদী পেরোন, আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা একই কথা। কি করা যায়?

আফ্রিকান ছেলেটি বলল ঃ আর একটু উত্তরের দিকে এগোলে ভালো হয়, কারণ নদীর ঐ দিকটা সরু। আর জলহস্তীর সংখ্যাও এত হবে না। তবে দু' একটা থাকা অসম্ভব নয়।

আমরা আফ্রিকান ছেলেটির কথামত নদীর তীর ধরে উত্তরের দিকে এগিয়ে চললুম।

নদীর পাড়টা ক্রমশঃ খাড়াই হয়ে আসছে ঃ নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একদল জলহস্তী বিরাট হাঁ করে আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাই দেখে পটলবাবুর আবার পিলে চমকে গেলো, আর একটু হ'লে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন, আমি ফস্ করে ধরে ফেললুম।

আফ্রিকান ছেলেটির কথাই ঠিক। কিছুটা এগিয়েই নদীর তীরটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, নদীর এই দিকটা অনেকটা সরু। হাঁটু জল। টলটলে পরিষ্কার জল। অবশ্য স্রোতের টান খুব জোর।

আমরা ধীরে ধীরে নদীটা পেরিয়ে ওপারে চলে এলুম। কিন্তু শেষের কুলীটা আর পেরোতে পারলো না। একটা জল-হস্তী ছুটে এসে ওকে ধরে ফেললো। সেকি বীভৎস দৃশ্য! দেখে আমরা সবাই আঁৎকে উঠলুম।

এপারে এসেও কি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় আছে? হঠাৎ দূরে দেখলুম, বন-জঙ্গল লোপাট করতে করতে একদল বুনো হাতী ছুটে আসছে। আমরা একটা বিরাট পাথরের চাইয়ের পেছনে লুকিয়ে রইলুম।

সবার আগে এলো দলপতি হাতীটা। পাথরের চাঁইয়ের কাছাকাছি এসে—একবার এদিক-ওদিক তাকালো। ওর বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল। হাতীদের ঘ্রাণশক্তি সাংঘাতিক প্রবল। পেছনের দলটা এসেও অনেকক্ষণ থমকে দাঁড়ালো। তারপর আবার বন-জঙ্গল লোপাট করতে করতে সামনের দিকে চলে গেলো।

হাতীর দল চলে যাওয়ার পর, আমরা পাথরের চাঁইয়ের পেছন থেকে বেরিয়ে এলুম। প্রায় আধঘন্টা চলার পর, কিছুদূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। দুরে চার্চের ঘন্টাধ্বনিও শুনতে পেলুম। এই সাংঘাতিক জঙ্গলেও মিশনারীরা এসে চার্চ করেছে। চার্চের সেই ঘণ্টাধ্বনিকে অনুসরণ করে—আমরা

চার্চে চলে এলুম। চার্চের সামনের মাঠে দেখলুম, বেলজিয়ান সৈন্যদের তাঁবু।

চার্চের ফাদারকে জিজ্ঞেস করে জানলুম, সৈন্যসংখ্যা প্রায় এক হাজার, ওরা এ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের জন্য এসেছিল, আবার আগামী কাল কংগোর রাজধানী লিওপোলডভিলে ফিরে যাবে।

চার্চের ভেতরের একটা বিছানায় দেখলুম, মিঃ রায়। যার খোঁজে আমরা এই কংগোর গভীর জঙ্গলে প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে এসেছিলুম।

ফাদার বললেন: ওকে তিনদিন আগে বেলজিয়ান সৈন্যদের সাহায্যে নরখাদক নিগ্রোদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। ওর দলের আর কেউ নেই, সবাই মারা গেছে।

পরদিনই আমরা মিঃ রায়কে সঙ্গে করে বেলজিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে কংগোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলের দিকে যাত্রা করলুম। পথে আর তেমন কোন বিপদ হয়নি।

লিওপোলডভিলে একদিন বিশ্রাম করে, দার-এস-সালাম বন্দরে চলে এলুম। তারপর ভারতের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে রওনা দিলুম। কংগোর জঙ্গল আমাদের পেছনে পড়ে রইল শেষে।

॥ সমাপ্ত ॥